Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 35 – 45
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

শহীদ কাদরীর কবিতার চিত্রকল্প : প্রাকরণিক প্রতিভাসে কাব্যযাপনের ভিন্নস্বর

আরিফা সুলতানা
প্রভাষক, বাংলা
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলোজি, কাদিরাবাদ, নাটোর
Email ID : shilpoarifa2010@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Painting, Western poetic movement, Expressionism, Surrealism, Interrealism, Extrorealism, Art, Society, Introspection, Environment.

Abstract

Shaheed Qadri (1942 - 2016) is a different generation of representative poetic practice of six decades of Bangladesh. His self-absorbed lifestyle in poetry; Makes him particularly familiar with novelty of subject and style. By composing only four poems, he marked his own position in Bengali poetry. He associated himself directly with the representational poetry movement of the sixties. Sad generation, *Shakkhor*, *Konthoshhor*, *Shamakal*, *Kavikantha etc.* He is one of the leaders of the Little Magazine Movement. In the tumultuous political struggle environment of the 1960s, he has left the signature of originality in his own poetic spirit by acquiring different knowledge of poetic style from Euro-American poets. Urban sufferings, conflicts, civil loneliness are expressed in different degrees in his poems. He wanted to see the whole society, state, country or the whole world from a distance outside the world from the position of the isolation that the prevailing colonial economic conflicts made him look for the exile of the historical event of independence, the partition of India, the cry of subjugation of the people of East Bengal after the creation of Pakistan. He wanted to isolate himself from civil society for a scumbag situation. So, from Shahid Qadri's first poem *Utaaradhikar* (1963), *Tomake Abhibadan Priyatma* (1974), *Kothao Koo Krandan Nei* (1978), and *Amar Chumbongulo pouchay dao* (2009), his life has been full of devotion to art in all his poems Wrote the saga. In the discussion article, Shahid Qadri's poetry will be discussed about how the literary format in the style of imagery has created his unique poetic world and how it has added a new poetic dimension to Bengali poetry.

Discussion

চিত্রকল্পের প্রতিভাসে কবি শহীদ কাদরীর কাব্যদর্শন বাংলা কাব্যে ভিন্নধর্মী জীবন আস্বাদনের দিগন্ত উন্মোচন করে। সচেতন পাঠক মাত্রই তাঁর কাব্যচর্চার আকড় সম্পর্কে অবগত হন- যেখানে তাঁর সামগ্রিক বিষাদ, নৈরাশ্য, স্বপ্ন কল্পনা অথবা বাস্তবতা সম্পর্কে জারিত অভিজ্ঞতা বহুধা চিত্রকল্পের সমন্বয়ে তাঁর স্বদেশ, সমকাল অন্বিষ্ট চিন্তাকাঠামোকে আঁচ করতে পারে। শহীদ কাদরী বর্হির্জগতের রূপ-রস-গন্ধ তাঁর স্বকীয় কবি প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষ অন্তঃসৃজন প্রক্রিয়ায় তাঁর কাব্য শরীরে গেঁথে দেন। ফলে তাঁর কবিতায় বিম্বিত চিত্রকল্প হৃদয়সংবেদী পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত করে এক অভিন্ন বোধজাগতিক সুর। কিন্তু শিল্পী তার সৃষ্টিত ভূমিতে যে জগৎকে নির্মান করেন সেটি দৃশ্যজগতের হুবহু অনুকরণ হয় না।

> "বাইরের জগৎ যখন কবির বিশেষ কল্পনাশক্তির সংবেদ্যতায় বিশিষ্ট মূর্তি লাভ করে পাঠকচিত্তেও একই সংবেদনা কিংবা অনুরূপ অনুভববেদ্যতা সৃষ্টি করে তখনই সেটি রসোত্তীর্ণ হয়ে কাব্য বলে গণ্য হয়। বাইরের জগতকে এ নবতর সৃজন প্রক্রিয়ায় প্রকাশের জন্য যে যে কৌশল গ্রহণ করা হয় চিত্রকলা (Image) তার অন্যতম।"[১]

কবিতার হৃদয় হচ্ছে চিত্রকল্প। মানব দেহের রক্তপ্রবাহে হৃদপিণ্ড যেমন বিশেষ অবদান রাখে তেমনি কবির বিশেষ ভাবকে কবিতায় সম্পৃক্তায়ন ও সঞ্চালন করার কাজে চিত্রকল্প পালন করে অতুলনীয় দায়িত্ব। 'চিত্রকল্পকে কবির অনন্যবোধ ও কল্পনার অভিব্যক্তি বা ভাব মূর্তি বলেও অভিহিত করা যায় এবং স্বয়ং কবিতার মর্মসূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[২] চিত্রকল্প সম্পর্কে স্টিফেন স্পেন্ডার বলেন- 'The image is the basic unit of poetry...'[৩] 'চিত্রকলা শব্দ-সমন্বয়ে, কবির মনোচিত্রের অভিজ্ঞতা লব্ধ একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গি যা সহজেই পাঠকচিত্তে নতুন অভিব্যক্তির জন্ম দিতে সক্ষম।[৪] শহীদ কাদরীর কবিতায় বিবিধ অনুষঙ্গে চিত্রকল্পের প্রতিভাস অতিমাত্রায় উদ্ভাসিত। সমকালীন পারিপার্শ্বিকতার উর্ণাজালে অবগাহন করে তাঁর কবিতার বিচিত্রসব চিত্ররা। কবিতায় চিত্রকল্পের অঙ্কিত প্রেক্ষাগ্রহ কখনো ছুঁয়েছে দৃষ্টির দরজা, কখনো শ্রুতির-স্পর্শের, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, স্পর্শের আবার কখনো স্বাদের রূপকল্পে। সর্বোপরি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অবগাহনে নিমজ্জমান তাঁর কবিতার চিত্রকল্পসমূহ। বাংলাদেশের ছয়ের দশকের কবিতা প্রকরণগত দিক থেকে ইঙ্গমার্কিন কবিতার প্রাকরণিক ধারণাকে আত্মস্থ করে স্বীয় দেশ কালের প্রেক্ষাপটে যে স্বকীয় কাব্যিক ভুবনে বিচরণ করেছে, শহীদ কাদরীর নির্মিত চিত্রকর্ম তারই সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর কবিতার চিত্রকল্পে এসেছে পাশ্চাত্য বিবিধ 'ইজম' যেমন- 'অভিব্যক্তিবাদ, 'অন্তমুর্দাবাদ, 'পরাবাস্তববাদ' প্রমুখ। পাশ্চত্য বিবিধ শিল্প আন্দোলন সচেতনভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে চিত্রকল্প নির্মাণে তিনি প্রাকরণিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তবে কেবলমাত্র প্রাকরণিক পরীক্ষা - নীরিক্ষা করার উদ্দেশ্যেই কবিতা লিখেছেন তা নয়। তাঁর আভ্যন্তরীন স্বতঃস্ফূর্ততার সরল সমীকরণই মিলিয়ে দিয়েছে উপমা, রূপক, প্রতিমা তথা রঙ, রূপ, বর্ণ সম্মিলিত বহুবর্ণিল চিত্রকল্পের দিশা। স্বাধীনতা পূর্বের সেই দোলাচল সময়ে সবকিছুই যখন বিচ্ছিন্ন, অন্তঃসারশূন্য, তখন ব্যক্তিক কবি তাঁর চেতনার অন্তরালে অবচেতনে গিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন তাঁর কাব্যবোধের অপর এক চেতনজগতে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দিকভ্রান্ত কবি সর্বত্র দেখেছেন যুক্তিহীনতা। শহীদ কাদরী তাঁর কাব্যবোধের নিগুঢ় যাত্রার নিবিড় পথটিকে বইয়ে দেন অলৌকিকতার আপাত রম্যে, রহস্যের উল্লাসে, স্বপ্নের বহুজৈবনিক বিস্তুর্ণতায় এবং যুক্তিহীনতায়। কখনো আবার অবসর পান বহুদূর অরণ্যে বা মাটির গুহায় আবার কখনো আকাশের একটি মাত্র নক্ষত্রের মধ্যে। নিত্যপ্রবাহিত যাপিত জীবনের নষ্ট রঙ্গের ক্লেদাক্ত বিষণ্নতার মাঝে সুখ খুঁজে ফেরেন। চিত্রকল্প সৃজনে শহীদ কাদরীর প্রকরণগত ঋদ্ধতা স্বাতন্ত্র চিহ্নিত এবং বিচিত্র ইঙ্গিতবাহী। শহরের বিচিত্র অনুষঙ্গকে উপাদান হিসেবে নিয়েছেন তিনি চিত্রকল্প নির্মান করতে গিয়ে। গ্রামীণ-নৈসর্গিক বিবিধ উপকরণ তাঁর চিত্রকল্পে বেশ লক্ষনীয়। এছাড়াও বাঙালির এবং বিশ্বনাগরিক চেতনালালিত পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব এবং ধর্মীয় অনুষঙ্গের প্রয়োগ করে চিত্রকল্প সৃজনে শহীদ কাদরীর দক্ষতা অনন্য। নাগরিক হতাশা, শূন্যতা, অস্তিত্ববোধ, ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ সহ প্রমুখ অভিব্যক্তি তাঁর কবিতার চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে। শহীদ কাদরীর কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পের কয়েকটি দৃষ্টান্ত –

১. পাখির ছানার মতো দ্রুত সপ্রাণ লাফিয়ে ওঠা
পলায়নপর একটি অপটু
গোলাপের কম্প্র গ্রীবা ধরে আমিও চিৎকার করে
বোল্লাম : যা দেখছো শুধু ছদ্মবেশ এ আমার
এই জামা, এই ট্রাউজার,

- 'নিসর্গের নুন' : *উত্তররাধিকার*

২. হরিদ্রাভ আকাশের ওষ্ঠে জমে ওঠা
আমি কি হঠাৎ কোন পথভ্রষ্ট চুন?
দৈবাৎ বিক্ষিপ্ত এই বিশ্বলোকে
মুহ্যমান নগরশীর্ষে
লুটিয়ে পড়া এক নির্বাসিত কেতন
অথবা শূন্যতার সৌর গলায় নক্ষত্রচ্ছেল বমন?

- 'জন্মবৃত্তান্ত' : *উত্তরাধিকার*

৩। সংবাদপত্রের শেষ পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসেছে
এক দীর্ঘ সাঁজোয়া-বাহিনী
এবং হেডলাইটগুলো অনবরত বাজিয়ে চলেছে সাইরেন।

- 'স্কিৎসোফ্রেনিয়া' : *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা*

১ - সংখ্যক দৃষ্টান্তে কবি তাঁর ছদ্মবেশী অস্তিত্বের বহুমাত্রিক অসংলগ্ন, পলায়নপর রূপটিকে যথার্থ উপমেয় 'আমি'কে উপমান 'পাখির ছানার মতো সপ্রাণ লাফিয়ে ওঠা', অপ্রাণ গোলাপের কম্প্র গ্রীবার চিত্রকল্পে ব্যক্ত করেছেন। যা মূলত ষাটের অবক্ষয়জনিত যুগমানসে পিষ্ট কবির ব্যক্তিক অভিব্যক্তি।

২ - সংখ্যক দৃষ্টান্তে কবির অস্তিত্বসংকটের প্রশ্নটি আরো গাঢ় হয়ে যায় 'পথভ্রষ্ট চুন', শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে।

৩ - সংখ্যক দৃষ্টান্তে সমসাময়িক যুদ্ধকালীন বাস্তবতার ভয়াল পরিস্থিতিটি কবিকল্পনায় চিত্ররূপ পেয়েছে দারুণ স্পষ্ট কিন্তু যথার্থভাবে।

৪. দেখলাম একটা শাদা চকচকে মাছ
প্রাচীন মসজিদের মতো বয়োবৃদ্ধের
বড়শীতে গাঁথা পদ্মপুকুরে
লাফাচ্ছে কী রঙ্গ আহ্লাদে
ঘর-ফেরা সন্ধ্যায়

- 'আইখম্যান আমার ইমাম' : *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা*

৫. চারিদিকে তাকালো সে
তামাটে মুখে বিরক্তি আর বয়সের রেখা
সম্ভবত তিনদিনের বৃষ্টি
তার স্বপ্নের দেয়ালে হলদে স্যাঁৎসেতে চিত্র রেখেছে

- 'ভরা বর্ষায় : একজন লোক' : *উত্তরাধিকার*

৬. তোমার ক্লেদ সহসা ইন্দ্রধনু হল
আর আমি কাঁকড়ার মত
অনুর্বর উল্লাসে ভোজে মত্ত, একর পর এক
শুধু ক্ষত তৈরি করলাম।

- 'পরস্পরের দিকে' : _উত্তরাধিকার_

৪ - সংখ্যক দৃষ্টান্তে 'মাছ' উপমেয়ের সাথে উপমান চিত্র 'প্রাচীন মসজিদের মতো বয়োবৃদ্ধ'এক ভিন্ন পরিস্থিতির প্রকাশক। কিন্তু মাছটি শাদা চকচকে বিশেষ্যের বিশেষনের এরূপ প্রয়োগে সৃষ্ট চিত্রকল্পটি অন্য এক বোধের ব্যঞ্জনাবাহী। যেখানে প্রাচীন মূল্যবোধের টানাপোড়নে কবির জাগ্রত বিবেক, বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে অস্তিত্ব উপলব্ধিতে।

৫ - সংখ্যক দৃষ্টান্তে নিঃসঙ্গ কবি তাঁর স্বপ্নের উল্টো বয়নচিত্র সমাজে প্রত্যক্ষ করতে করতে ক্লান্ত। 'তিনদিনের বৃষ্টির' এই অন্তিম বেলায় কবির স্বপ্নের দেয়ালে পড়েছে স্যাঁতসেতে আস্তরণ। চিত্রকল্পে কবির দার্শনিক প্রয়াস প্রস্ফুটিত।

৬ - সংখ্যক উদাহরণে 'ক্লেদকে ইন্দ্রধনু চিত্রকল্প সৃজনে ক্লেদের পরিমাণকে যেন বহুগুণ বাড়িয়ে তোলেন। 'কবি হওয়া' এবং কবির 'কাকড়ার মতো অনুর্বর উল্লাসে ভোজে মত্ত হওয়ার' এক দ্বান্দ্বিক চিত্রকল্প সৃজন করা হয়েছে এখানে। ক্লেদ যখন মাত্রাতিরিক্তি বেড়ে যায় তখন সকল রঙকে গ্রাস করে বলে ক্লেদের এরূপ চিত্রকল্প সৃষ্টি করেন কবি। কবির বিবরবাসী মনেভঙ্গির যর্থর্থ রূপায়ন হয়েছেন এখানে।

> ''ইন্দ্রিয়জ রূপরসগন্ধ, স্পর্শময় চিত্রকল্পে ষাটের কবিরা নাগরিক ক্লেদ, গুহায়িত উন্মুল জীবন প্রবৃত্তির প্রবল অভিঘাত, অস্তিত্বের প্রগাঢ় চেতনা ও অতলান্তিক মনোবেদনাকে ধারণ করেছেন। ফলত চিত্রকল্পসমূহ হয়ে উঠেছে কবিদের ব্যক্তি চৈতন্যের নিগূঢ় প্রতিভাস।''[৫]

শহীদ কাদরীর কবিতার চিত্রকল্পে ব্যঞ্জিত হয়েছে এমনি সব গভীরতার ছাপ। চিত্রকল্পের এমন আরোকিছু দৃষ্টান্ত –

১. ভয়াল, হিংস্র তোমার মুখের সারি
লৌহ কঠিন বিশাল উদর খোলা যেন সিন্দুক
ভরে দেরো সোনাদানা॥

- 'প্রেমিকের গান' : _উত্তরাধিকার_

২। নামহীন অহংকারে হলুদ একসার বিকৃত
মুখ
পরস্পর থেকে ফেরানো; হৃদপিন্ডের মধ্যে লুকানো
নিতান্ত নিজস্ব

- 'সঙ্গতি' : _উত্তরাধিকার_

৩। একদা চয়ন ক'রে সভ্যতার মৃত অন্ত্র ছেন
কোনোমতে শুঁকে- শুকে, ভয়ে, সরল জিহ্বায় চেখে
ইন্দ্রিয়সর্বস্ব, ক্ষুধামত্ত জন্তু যেন একরোখো!

- 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' : _উত্তরাধিকার_

৪। রাত্রে তোমাকে স্বপ্নেও দেখি
গণিকালয়ের সারিতে একা

- 'প্রিয়তমাসু' : _উত্তরাধিকার_

শহীদ কাদরীর কবিতায় 'ইম্প্রেশনিস্টিক' চিত্রকল্পের বহিঃপ্রকাশ লক্ষনীয়। 'ইম্প্রেশনিষ্টিক চিত্রকল্প কবিচৈতন্যের গহন অঞ্চলের সংবেদনশীল সম্প্রকাশ। বহির্জাগতিক দ্বন্দ্বময় অভিঘাতে অন্তর্জগতের সঙ্কোচন এবং প্রতিক্রিয়াতেই ইম্প্রেশনিজমের সূচনা'।[৬] মূলত চিত্রকলাকে কেন্দ্র করেই ইম্প্রেশনিজম (Impressionism) শব্দটি আলোচিত।

> ''বহির্বাস্তবতার রঙ, রূপ, রস প্রভৃতির পারিপার্শ্বিকতাসহ বর্ণ ও আলোর প্রতিসাম্যে উপস্থত করাই মূলত ইম্প্রেশনিস্টদের উদ্দিষ্ট। একজন ইম্প্রেশনিষ্ট শিল্পী বা কবি আলোর বহুবর্ণিল রঙ, কালিক প্রবাহে, অর্থাৎ ভোরে, সকালে, দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যায়, রাতে তার উপলব্ধি ও অভিব্যঞ্জনাকে তুলে ধরেন, কোন পরিবেশে

> আলোর অবয়ব কেমন এবং তার রূপান্তর চিত্রকর্মে বিধৃত করাই ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীয় মূল্য লক্ষ্য। বর্ণ ও আলোর মেজাজ পরিস্ফুট করার মধ্যেই অন্তমুর্দাবাদের গুরুত্ব নিহিত।"[৭]

শহীদ কাদরী তাঁর কবিতায় সৃজনীশক্তির অভ্যন্তরীন ক্যানভাসকে বাস্তবতার আদলে আলো-ছায়ার রহস্যময় শরীরে মুড়িয়ে ইম্প্রেশনিস্টিক চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। যেখানে প্রকৃতি আর সময়ের বিচিত্র চিত্রকল্পগুলো হয়েছে স্বেচ্ছাধর্মী। যেমন –

১. চারদিক কালো-মাথা তবু গোধূলিতে কী সুন্দর
ওই সিন্ধুজল
কেঁপে ওঠে, তরঙ্গ ছড়ায় পরীদের গন্ধবাহী
মন্থর হওয়ায়
ক্ষীণায়ু মোমের মতো ম্লান সূর্য- প্রয়াণের পর
- 'কবি-কিশোর' : *উত্তরাধিকার*

২. রাত্রে চাঁদ এলে
লোকগুলো বদলে যায়
দেয়ালে অদ্ভুত আকৃতির ছায়া পড়ে
যেন সারি সারি মুখোশ দুলছে কোন
অদৃশ্য সুতো থেকে
- 'ইন্দ্রজাল' : *উত্তরাধিকার*

শহীদ কাদরীর কবিতায় 'এক্সপ্রেশনিষ্টিক' বা (অভিব্যক্তিবাদ) চিত্রকলার প্রভাবও বিচিত্র শব্দবন্ধের দৃশ্যময় উপস্থাপনে বিদ্যমান। এক্সপ্রেশনিজমের (Expressionism) বা অভিব্যক্তিবাদের সূত্রপাত ঘটে জার্মানিতে। **১৯১০** থেকে **১৯২৫** সালের মধ্যবর্তী সময় এবং তার পরবর্তীতে এই ইজমটি বিস্তৃতি পায়। রিয়েলিজম এবং ন্যাচারালিজম থেকে উদ্ভুদ এ আন্দোলনটির উদগাতারা ছিলেন বাস্তবের ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির প্রতি অতিমাত্রায় বিরক্ত। প্রথাবদ্ধ যুক্তি, বিশ্বাস এক্সপ্রেশনিস্টিকদের প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করেছিল, ফলে তারা শিল্পে যে বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করলেন তা আগাগোড়া যুক্তি ও অযৌক্তিকতার 'মিশেল'। বিশৃঙ্খল, অন্ধ, ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার প্রতিবিম্ব রূপায়ন করাই এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের ব্রত হয়ে উঠেছিল।

> "চিত্রকলায় এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীরা আঁকাবাঁকা অসংলগ্ন রেখার মাধ্যমে বস্তুর বিকৃতাবয়ব রূপায়ন করলেন। রঙ-ব্যবহারে শিল্পীরা চড়া রঙ ব্যবহারে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁদের বর্ণাঢ্যতায় ছিল অসংলগ্ন স্বপ্ন কল্পনার সংমিশ্রণ; এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের অগ্রগণ্য হলেন- ভ্যানগগ, (Van Gogh 1853-1890) এবং এডভার্ড মুঙ্ক (Edvard Munch 1863-1944)।"[৮]

শহীদ কাদরীর কবিতায় অভিব্যক্তিবাদী চিত্রকল্প ছয়ের দশকের বিশৃঙ্খল জীবন প্রতিবেশের বহিঃপ্রকাশক। যেখানে কবির অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা যুগ্মপথ বিচরণ করেও থেকেছে দ্বান্দিক অবচেতনে নেতিপুষ্ট। কবিতায় এর প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন –

১। তীক্ষ্মধার জনতা এবং তার একচক্ষু আশার চিৎকার!
পূর্ণিমা প্রেতার্ত তারা নির্বীজ চাঁদের নীচে, গোলাপ বাগানে
ফাল্গুনের বালখিল্য চপল আঙুলে, রুগ্নউরু প্রেমিকার
নিঃস্বপ্ন চোখের 'পরে নিজের ধোঁয়াটে চোখ রাখে না ভুলেও,
- 'নপুংসক সন্তের উক্তি' : *উত্তরাধিকার*

২। উনুনের লাল আঁচে গাঁথা-শিকে জ্বলছে কাবাব,
শীতরাতে কী বিপজ্জনক ডাক দ্যায় আহ্লাদে শহর,
কালো রাস্তার বেঞ্চিতে চলো যাই পঙ্ক্তিভোজনে, ক্ষান্ত তবে
হবে কি প্রেতার্ত ক্ষুধা? লকলকে আগুনের মতো নাচে
জিহ্বা নাচে!

- 'মোহন ক্ষুধা' : *উত্তরাধিকার*

৩। ক্যাপ্টেন, তোমার কালো চকচকে বুটের ভেতর
এতক্ষণে কয়েক ইঞ্চি শিশির জমেছে,
সর্বত্রগামী জ্যোৎস্না কুণ্ডলী পাকিয়ে
শুয়ে আছে বুটের গহ্বরে

- 'কে যেন বলছে' : *কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই*

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মূল্যবোধ পূর্বেকার প্রচলিত জনপ্রিয় শিল্পসমূহকে বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করে। শিল্পের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাস্তবের পোড়ামাটিতে দাঁড়িয়ে জীবনযুদ্ধে ভঙ্গুর হওয়া মানুষগুলো প্রশ্ন তোলে। প্রশ্ন ওঠে শিল্পসৃষ্টির যৌক্তিক ভিত্তি ও তার নৈতিক গুরুত্ব নিয়ে।

> "নতুন কালের এই চেতনায়, বাস্তবতায় অসংলগ্ন, অধরা ও সদ্য অপসৃয়মান চরিত্র মূখ্য হয়ে ওঠে। শিল্পীর যে অভিজ্ঞতাকে শিল্প সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, তার বৈধতা নিয়েই সংশয় দেখা দেয়, ফলে কোনোকিছু সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ, নিটোল ও কেলাসিত প্রত্যয় গড়ে ওঠতে পারে না।"[৯]

এই পরিস্থিতিতে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে 'ডাডাবাদ' নামক একটি নেতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। 'ডাডা'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর উদ্গাতাগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন –

> "বাস্তবতা যেহেতু সর্বদা অধরা ও অসংলগ্নতায় ভরা, সেহেতু কোনো আঙ্গিকেই তাকে ধরা সম্ভব নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সবসময় ভুল তথ্য জোগাচ্ছে এবং চেতনা মূলত অব্যবহৃত কিছু অভিজ্ঞতার অসংলগ্ন পরম্পরা। জীবন যেহেতু তাৎক্ষনিক ও নশ্বর অনুভবের সমাহার- তাকে স্থায়ী, ক্লাসিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করা বৃথা।"[১০]

হান্স আর্প লিখেছেন --

> "We were seeking an art based on funda mentals to cure the madness of the age and a new order of things that would restore the balance between heaven and hell."[১০]

আর ডাডাবাদের উত্তরসূরী হিসেবে 'পরাবাস্তববাদে'র উদ্ভব ১৯২৪ সালের দিকে। পরাবাস্তববাদের মূল উদগাতা ফরাসী কবি-সমালোচক আঁদ্রে ব্রেঁত (১৮৯৬ - ১৯৬৬)। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি একটি মানসিক হাসপাতালে মনোচিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ফলে মানসিকভাবে ভারসম্য হারিয়ে যাওয়া মানুষের অবচেতনের বিচিত্র গতিবিধি তাঁর মনে এক ভিন্নমাত্রিক প্রণোদনার জোগান দেয়। মনোরোগীদের বিচিত্র কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে অবচেতনের যে অদ্ভুদ জারকের সন্ধান ব্রেঁত পেয়েছিলেন, তৎসংশ্লিষ্ট স্বপ্ন ও বিভ্রম তাঁকে টেনে নিয়ে যায় পরাবাস্তব জগতে। তিনি মূলত ফ্রয়েডীয় কলাকৌশল প্রয়োগ করতেন রোগীদের ওপর। তিনি সারা বিশ্বে পরাবাস্তববাদকে জনপ্রিয় করেন এবং একে একটি 'শিল্প আন্দোলন' রূপে গড়ে তোলেন। ১৯২৪ সালে ব্রেঁত পরাবাস্তববাদের প্রথম ইশতেহার প্রকাশ করেন গিওম অ্যাপোনিনেয়ারের (১৮৮০ - ১৯১৮) একটি লেখা থেকে Surrealist শব্দটি নিয়ে। পরাবাস্তববাদের মূল কথা –

> "অবচেতন মনের ক্রিয়াকলাপকে উদ্ভট ও আশ্চর্যকর সবকল্প দ্বারা প্রকাশ করা। ডাডাবাদীরা চেয়েছিলেন প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে মানুষকে এমন এক তীক্ষ্ম নান্দনিক দৃষ্টির অধিকারী করতে যার মাধ্যমে সে ভেদ করতে পারবে ভন্ডামি ও রীতিনীতির বেড়াজাল, পৌঁছাতে পারবে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 35-45
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> সুররিয়ালিজম আরো এক ধাপ এগিয়ে বলল, প্রকৃত সত্য কেবল অবচেতনেই বিরাজ করে; পরাবাস্তববাদী শিল্পীর অন্বিষ্ট হল সেই সত্যকে গভীর থেকে তুলে আনা তার কৌশলের মাধ্যমে।"[১২]

শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১ - ৬৭), জ্যাঁ আর্তুর র‍্যাবো (১৮৫৪ - ৯১) এবং দ্য লত্রেম (১৮৪৬ - ৭০) পরাবাস্তববাদের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছেন। 'তবে সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬ - ১৯৩৯) এবং গুস্তাভ ইয়ুং (১৮৭৫ - ১৯৬১) এর মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং অবৌদ্ধিক ও আধিদৈবিক বিষয়ের প্রতি নবজাত আকর্ষণ এ আন্দোলনের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল।[১৩] চিত্রকলায় এ তত্ত্বের প্রয়োগ সর্বাধিক হলেও কবিতা ও উপন্যাসেও এর বিস্তর বহুবিধ। আদি সুররিয়ালিস্টদের মধ্যে আছেন পল এলুয়ার (Paul Eluard), বেনজামিন পেরে (Benjamin Piret), রেনে ক্রেভেল (Rene Crevel), জাক বাঁর (Jacques Banon) মাক্স এর্নস্ত (Max Errst), হানর্থ আর্প (Hans Arp), জন মিরো (Joan Miro), মান রে (Man Ray), জাক প্রেভর (Jacques Prevert), অঁরি মিশো (Henri Michaux), মার্সেল দুশ্যাম্প (Marchel Duchamp)। পরবর্তীকালে পরাবাস্তববাদের ব্যাপক ব্যবহার করেন নাটকে জাঁ জেনে (Jean Genet), ইউজেন আয়ানেস্কো (Eug Ionesco) এবং স্যামুয়েল ব্যাকেট। তারা পরাবাস্তববাদের আশ্রয় নেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার প্রকোপে। অত্যাধিক বুর্জোয়া নীতিচিন্তা কীভাবে বিশ্বযুদ্ধের আগুনকে ঘণীভূত করে তুলছিল তা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁদের রূপায়িত প্রতীকী বাস্তবতার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে বুর্জোয়া শক্তির অবসান চাওয়া। যুদ্ধশেষে তাঁরা ফ্রান্সে গিয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মতটির উপর ভিত্তি করে চিত্রকলার প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ, আড্ডা ইত্যাদির সূচনা করেন। সেখানেই অন্দ্রে ব্রেঁত, লুই আঁরাগ (১৮৯৭ - ১৯৮২) ও ফিলিপ সোপল্ট (১৮৯৭ - ১৯৯০) একত্রে ১৯১৯ সালে *Literature* নামক সাহিত্য পত্রিকার বের করেন। ফলে 'স্বতঃস্ফূর্ত লেখনি' বা 'অটোমেটিক রাইটিং' এর ধারা চালু হয় তাঁদের প্রচেষ্টায়। অটোমেটিং রাইটিং এর মূল উদ্দেশ্য হলো- কবি তার চিন্তার ওপরকার সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে, চিন্তাস্রোতে কোনো প্রকার বাধা না রেখে, যা কিছু তার মনে আসবে তাই লিখে যাবেন। অথবা আঁকবেন। এ ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ পরাবাস্তববাদী শিল্পী হলেন সালভাদর দালি (১৯০৪ - ১৯৮৯)। তাঁর চিত্রকলায় উঠে এসেছে অবচেতন মনের প্রক্ষেপিত বিচ্ছিন্ন 'ইমেজ'। তাঁর চিত্রকলার একটি বিখ্যাত উদাহরণ The persistance of Memory (১৯৩১)। স্বপ্ন ও অদ্ভুত সব চিত্রসৃজনে পরাবাস্তববাদীরা ছিলেন তৎপর। তাঁরা বুঝতে চাইতেন, ঘুমন্ত ও নির্ঘুম অস্তিত্বের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক বা ব্যবধান ক্রিয়াশীল থাকে। আর চেতন-অবচেতনের বিচিত্র খেয়ালে কেমন সব ঘটনা বিক্ষিপ্তভাবে প্রস্ফুটিত হয়। ১৯২৪ সালে আঁন্দ্রে বেঁত *'ম্যানিফেস্ত দ্যু সুররিয়ালিজম'* প্রকাশ করেন। তিনি বললেন- 'মনকে সমস্ত প্রকার বিচারবুদ্ধি এবং লজিক থেকে মুক্তি দেয়া জরুরি'। দ্বিতীয় পরাবাস্তববাদী ইশতেহারে ব্রেঁত ব্যাখ্যা করেন কীভাবে সত্তার অতলান্তিকে হারিয়ে গিয়ে মানুষ পৌঁছাতে পারে অবচেতনের সেই গহীন রাজ্যে, যেখানে প্রচলিত ছকে বাধা জীবনের সমস্ত বৈপরীত্য একসাথে এসে জড়ো হয়'। যে ক্লেদ, জরা, সুন্দরের প্রতি তীব্র অনীহা নিয়ে পাশ্চাত্যের শিল্পীরা পরাবাস্তবের চেতনায় অবগাহন করেছেন, শহীদ কাদরীর মননে সে চেতনা সৃষ্টি হওয়ার পিছনে একই রকম প্রণোদনা সক্রিয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শতচ্ছিন্ন, বিবস্ত্র প্রকৃতির পোড়া পটভূমিতে শহীদ কাদরীর জন্ম ১৯৪২ সালের ১৪ই আগষ্ট ভোর তিনটা নাগাদ। যখন গোটা কলকাতা 'ব্লাক-আউট'। শহুরে জীবনের নিয়ম মাফিক যান্ত্রিকতাকে বালক বয়সেই তিনি প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পার্ক সাকার্স মাঠে আর্মির ট্রেঞ্চ, খিদিরপুর ডকইয়ার্ডে বোম্বিং, ভোরের বেলায় আর্মির বিওগল বাজিয়ে কুচকাওয়াজ, নিগ্রসৈনিকের গণিকার হাত ধরে রাস্তা পার হয়ে যাওয়ার দৃশ্য, 'কলকাতা লাইট হাউসে বোমা' এসব যুদ্ধ, ক্ষমতার লড়াই, দাঙা, মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের কৃত্রিম বন্ধন, শহীদ কাদরীর চেতনায় সেই বালক বয়সে গভীর ছায়া ফেলে। ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ এ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগে ভারত-চীন যুদ্ধ এদেশের মানুষের মাঝে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। শিল্পীরা নিজেদেরকে এসব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। তাই অন্তর্নিহিত বোধের টানাপোড়নকে পরাবাস্তবতায় রূপ দিতে তাঁরা সক্রিয় হলেন। ১৯৪৭ সালে ভারতভাগ। ধর্মের নামে মানুষের রক্তাক্ত লড়াই, হিন্দু-মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গায় গভীর শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হয় মানবিক অস্তিত্ব। ১৯৫২ সালে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসেন শহীদ কাদরী। বিশ্বপরিস্থিতিকে অবলোকন করেন শহীদ

কাদরী। আধুনিকতার অন্তর্বর্তীকালীন নোংরা স্রোতকে প্রত্যেক্ষ করেন, তাঁর সময়কালের দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে। ফলে ব্যক্তিমানসের চিন্তার গভীর স্তর থেকে তিনি পরিবেশ-পরিস্থিতির আপাতত সুরম্যের অন্তর্বতী ক্ষতকে অনুধাবন করছেনে। তাই কবিতার শরীরে তিনি কোন সহজ পরিচ্ছন্ন চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেননি। ক্ষুধা, মন্বত্বর, দেশভাগ, শোষণ, ঔপনিবেশিকতার আপাত দৃশ্যের ভিতরের দৃশ্য তাঁকে করে তোলে দ্বন্দ্বোন্মুখ। তাঁর কাব্যে বস্তুর কল্পনা, প্রকৃতির কল্পনা এবং মানুষের কল্পনা বারবার মূর্ত হয়ে ওঠে পরাবাস্তবের শিকড় সন্ধানে। পরাবাস্তব সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট ধারণা ছিল ঠিকই কিন্তু ছয়ের দশকের প্রেক্ষাপটে বাংলা ভূখন্ডে যে উগ্র মধ্যযুগীয় চর্চা চলেছে, তা তাঁকে নিয়ে গেছে পরাবাস্তবের জগতে। আবদুল্লাহ আবু সাঈদ শহীদ কাদরী সম্পর্কে বলেছেন –

> "বেপরোয়া, নজরুলি বন্যতা ছিল না ওর মধ্যে, ওর জীবনশক্তি ছিল মননধর্মী-তীক্ষ্ণ গভীর, সচেতন ও বলিষ্ঠ। বিশ শতকীয় ইউরোপীয় আধুনিকতার ও ছিল প্রায় মূর্ত প্রতীক। পড়াশুনায় ও চেতনাজগতে সেই আধুনিকতাকে ও ধারণ করতো। প্রথম ষাটের অনেক তরুণ লেখকদের আধুনিকতার চেতনা অনেকখানি ওর হাত থেকে পাওয়া। ... সেই পশ্চিমি আধুনিকতার উন্মুল মনোভঙ্গি, নিঃস্বতা' বোদলেয়ার বা আমেরিকার বিটনিক সম্প্রদায়ের বেহিশেবি, বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা, ক্যাম্যুর উপন্যাসের বহিরাগত মানুষ বা এলিয়টের শূন্য মানুষ- সবকিছুকে নিজের ভিতরে ধারণ করা এক রহস্যময় মানুষ হয়ে উঠেছিল ও সবার কাছে।"[১৪]

বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ এবং পরবর্তীতে বিষ্ণু দে পরাবাস্তববাদকে আতস্থ করে বাংলা কবিতাকে করেছে সমৃদ্ধ ও নতুন পথের দিশারী। তাঁদের হাত ধরে পরবর্তীতে বহু পরাবাস্তববাদী শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের পাঁচের দশকে শামসুর রহমান তাঁর কাব্য শরীরে পরাবাস্তবতার স্বার্থক রূপায়ন ঘটান। এবং ছয়ের দশকের আব্দুল মান্নান সৈয়দ এই ধারার উল্লেখযোগ্য প্রতিভা। তাঁর রচিত *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ* (১৯৬৭) কাব্যটিকে পরাবাস্তববাদের নামলিপি বলা যায়। আপতত বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্পের সমন্বয়ে নষ্ট সময়কে পরাবাস্তব চেতনায় তিনি যেভাবে ধারণ করেছেন তা অদ্ভুত। একটি উদাহরণ –

> জ্যোৎস্না ভূতের মত দাড়িয়ে আছে দরোজায়, সব দরোজায়, আমার চারদিকে যতগুলি
> দরজা আছে সময়ের নিলীমার পাতালের; জ্বলছে গাছসকল সবুজ মশাল; বাস একটি
> নক্ষত্র, পুলিশ একটি নক্ষত্র, দোকান একটি নক্ষত্র : আর সমস্তের উপর বরফ
> পড়ছে। - এরকম দৃশ্যে আহত হয়ে আমি শুয়ে আছি পথের উপর, আমার পাপের দুচোখ
> চাঁদ ও সূর্যের মত অন্ধ হয়ে গেল, আর যে-আমার জন্ম হলো তোমাদের করতলে
> মনোজ সে অশোক সে : জ্যোৎস্না তার কাছে ভূত কিন্তু একটি গানের উপর, দরজা
> তাঁর কাছে পুলিশ কিন্তু একটি জন্মের উপর, মৃত্যু তার কাছে দোজখ্‌ কিন্তু একটি ফুলের উপর।।
>
> \- 'অশোককানন' : *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*

শহীদ কাদরীও আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো একই পথের দিশারী। ষাটের নষ্ট সময়খন্ডের চিত্র সাদামাটাভাবে উপস্থিত হতে পারেনি তাঁর দায়বদ্ধ মনের কোঁঠায়। ব্যক্তিগত ক্লেদ, জঙ্গমতায় নিজেকে বারবার তিনি খুঁজেছেন পরাবাস্তবতার শহরে। সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মতো স্বকালের ভাষ্যকর হলেও ভাবপ্রকাশের কুশলতায় তাঁর কবিতার মূলভাষ্য অত্যন্ত তীক্ষ্ম। শিল্প কুশলতায় দেশীয় অনুষঙ্গের বৈচিত্রময় সম্ভার তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রকরণে তিনি নিঃশর্ত পরাবাস্তববাদী এবং প্রতীকি। 'আর তারই শিল্পীমানসের অবচেতন চিত্রাপণের মাধ্যমে বোধাতীত জগতের উৎসারণ, অন্বেষণ ও যাপিত-জীবনের আস্থাময় ইতিহাস উত্থাপন করেন।'[১৫] আত্মবিবৃতিময়, আত্মস্বীকারোক্তিপ্রবণ, শহীদ কাদরী কবিতায় এঁকেছেন নষ্টজীবনের হীনতা অবক্ষয়ের নষ্টালজিক সব পরাবাস্তববাদী চিত্রকল্প। শহীদ কাদরীর পরাবাস্তববাদী চিত্রকল্পের ধারা হল –

> ১। দেয়ালে ছায়ার নাচ
> সোনালি মাছের। ফিরে দাঁড়ালাম সেই

গাঢ়, লাল মেঝেয়, ভয়-পাওয়া রাত্রিগুলোয়
যেখানে অসর্তক স্পর্শে গড়িয়ে পড়লো কাঁচের
স্বচ্ছল আধার, আর সহোদরার কান্নাকে চিরে
শূন্যে, কয়েকটা বর্ণের ঝলক
নিঃশব্দে ফিকে হল; আমি ফিরে দাঁড়ালাম সেই
মুহূর্তটির ওপর, সেই ঠান্ডা করুন মরা মেঝেয়॥

- 'স্মৃতি : কৈশরিক' : *উত্তরাধিকার*

২। এবং গেঁথে রইল জানালার মরচে-পড়া সারি সারি শিকে
যেন আমার মৃত অশ্বের ছাল টানিয়েছে কেউ
অকরুন রোদ্দুরে!

- 'জানালা থেকে' : *উত্তরাধিকার*

৩। এবং আমার জানালা থেকে
নিরুপায় একজোড়া আহত পাখির মত চোখ
রাত্রিভর দেখবে শুধু
দূর দালানের পারে
আবছা মাঠের পর নিঃশব্দে ছিন্ন করে জোনাকির জাল-
ছুটে গেল যেন এক ব্যস্ত ভীত ঘোড়ার কঙ্কাল!

- ঐ

শহীদ কাদরীর নিঃসঙ্গ ব্যক্তিসত্তাটি পরাবাস্তবের চাদরে আবৃত। উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্পপ্রধান তাঁর কবিতাগুলো ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে রহস্যময় রাত্রি জাগানিয়া। অদ্ভুত সব রঙের বর্ণচ্ছটায়, নিস্তব্ধতার অলিতে গলিতে মৃত্যু, অন্ধকারের ঘোরে নির্মিত তাঁর পরাবাস্তব জগত। নক্ষত্র, দেয়াল, কাঁচ, মেঝে জানালা, দূর-দালান, জোনাকি, ঘোড়া' কঙ্কাল, নীল গাছ, জ্বলন্ত সূর্য, নৌকা ইত্যাদি বহু উপাদান ঘুরে ফিরে আসে তার পরাবাস্তব রহস্যের জাল বুঁনতে।

উপর্যুক্ত **১** - সংখ্যক দৃষ্টান্তে প্রতিটি চিত্রকল্প আবছা, অস্পষ্ট এবং রহস্যময়। যেখানে একটি মূহূর্তের বর্ণনা করছেন কবি। যে মূহূর্তটি কিছুক্ষণ আগে গত হয়েছে। মেঝেটাকে কবি একসময় বলছেন 'গাঢ় লাল' আবার পরক্ষণেই 'ঠান্ডা, করুণ, মরা'। রাত্রির পরিস্থিতিটা ভীতিজনক, যেখানে 'সহোদরার কান্নাকে চিরে শূন্যে গড়িয়ে পড়ে কাঁচের স্বচ্ছল আধার'। ফলে কবির নান্দনিক সব 'সোনালি মাছ'সেই পুরাতন ঝলক নিয়ে উপস্থিত নয় বরং 'ফিকে'। কবি দেখছেন 'সোনালি মাছের নাচ'এখন শুধু 'দেয়ালের ছায়া'হয়েই লেপ্টে থাকে 'সত্তা'জুড়ে। এ দৃশ্য একই সাথে বিচিত্র অভিমুখী এবং সংবদ্ধ। কবিতায় অবচেতনের এ বর্ণনা দৃশ্যত্মক এবং ইন্দ্রিয়প্রবণ অনুভূতিঘন। পরাবাস্তব এ চিত্রটির মধ্যে কবির নিঃসঙ্গসত্তার নিঃশব্দ সঞ্চারণশীলতা উপলব্ধি করা যায়।

২ - সংখ্যক দৃষ্টান্তে কবির 'মৃত অশ্বের ছাল জানালার মরচে পরা সারিসারি শিকে টানিয়ে রাখা'চিত্রকল্পটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গভীর সন্ধানী। অশ্ব যে শক্তির প্রতীক, যৌবনের প্রতীক তা কেউ নস্যাৎ করেছে। ফলে কবি তাঁর ভেতরের সত্তাটিকে বোধ করছেন একভীতি। করুন কণ্ঠে সেই বেদনাবোধ পরাবাস্তব আবহে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অকরুণ রোদ্দুরে 'কঠিন জানালা সদৃশ 'চেতনায়' মরচে জমেছে যেমন, তেমনি কারো দ্বারা প্রতারিত হয়ে 'জানালার শিকে গেঁথে' আছে কবির 'মৃত অশ্বের ছাল'। সমাজ ও মানবিকতার দায়বদ্ধতার স্বার্থে সমাকলীন পরাধীন জাতিসত্তার সমস্ত শক্তিকে এভাবেই কেউ মেরে ফেরতে চেয়েছিল যার আবহ বাংলা দেশের ঔপনিবেশিক সমাজচিত্রে ছিল প্রকট। কবির পরাবাস্তববোধের উৎসারণভূমি মূলত সেটি।

৩ - সংখ্যক দৃষ্টান্তে কবি তাঁর সমস্ত সত্তাকে 'জানালা' সদৃশ মনে করে চোখ দিয়ে অন্ধকার রাত্রিকে দেখছেন। যে চোখকে 'আহত পাখির চোখের'উপমানে প্রতিয়মান। একজন স্বাধীন মানুষের অস্তিত্বের ভঙ্গুরতা এই উপমায় ফুটে ওঠে। যে চোখ শুধু রাত্রির অন্ধকার দেখে দেখে অভ্যস্ত, সামান্য আলোর সন্ধান তিনি দেখতে পান 'দূর দালানের পর আবছা মাঠের পর আরো বহুদূরে জোনাকির ক্ষীণ জ্বলায়'। 'ঘোড়ার কঙ্কাল' সদৃশ কবির চেতন যেখানে ত্রস্ত, ভীত। এ পরাবাস্তব আবহ দেশ-কাল প্রেক্ষাপটের রুগ্নতাকে প্রতীকায়িত করে তোলে।

শহীদ কাদরী তাঁর হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মবোধ দিয়ে সৃজনশীলতার প্রতি গভীর অনুরক্ত থেকে বস্তুবিশ্বের আপাতরম্য আলোর বিপরীতে অন্ধকারের বিচিত্র ধ্বংসোন্মুখ চিত্রকে শিল্প প্রকরণের প্রত্যয়ে বেঁধে কবিতায় রূপায়ন ঘটিয়েছেন। তাঁর কবিতায় মিশ্রিত হয়েছে তাঁর সমস্ত হীনতার জৌলুস। কবির পরাবাস্তববোধের প্রকাশ সমাজের ঝকঝকে পরিচ্ছন্নতার উপরিতলকে স্পর্শ করে ডালপালা বিস্তার করে বহির্বরণে শেকড় ছড়িয়েছে। স্বদেশ, মানুষ তথা বিশ্ববিকতাকে, দগদগে ক্ষতচিহ্নে পরাবাস্তবের ভাষা দিয়েছে তাঁর কবিতা –

১. একটি মেয়ে খোঁপায় তার কোমল লাল গোলাপ
ছুরিতে বেঁধা কলকাতার শানানো ফুটপাতে
দেখেছিলাম ছেলেবেলায় ম্যানহলের পাশে
রয়েছে প'ড়ে স্তনের নীচে হা-খোলা এক ক্ষত
হুবহু এই লাল গোলাপের মতো।
আজকে তাই তোমার দেয়া কোমল লাল গোলাপ
তীক্ষ্ম হিম ছুরির মতো বিঁধল যেন বুকে॥

- 'গোলাপের অনুষঙ্গ': *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা*

২. কে যেন চিৎকার করছে প্রাণপনে 'গোলাপ! গোলাপ!'
ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়ছে তার সুমসৃণ লালা,

- 'বাংলা কবিতার ধারা' : *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা*)

শহীদ কাদরীর কবিতায় প্রাকরণিক বিন্যাসে অবক্ষয়িত যুগমানসের রূপকল্প নির্মাণে এভাবেই চিত্রকল্প নানা বোধের ধারক হিসেবে সমকালীন যুগ যন্ত্রণাকে তুলে ধরে। পাশ্চাত্য সাহিত্যলব্ধ শিল্পচেতনা তিনি স্ব সমাজের বিচিত্র দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরতে নিজস্ব শৈলির সমন্বয়ে ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে এ সকল চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন যা বাংলা কবিতায় যুক্ত করেছে ভিন্ন কাব্যস্বর। একটি পরাধীন দেশ থেকে **১৯৭১** এর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ এবং নতুন জন্ম নেওয়া এ রাষ্ট্রে মানুষের অগাধ আত্মস্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁর কবিতার শরীরে চিত্রকল্পের বিচিত্র অভিবব্যক্তি সমেত উঠে এসে নতুন ঝঙ্কারে বাঙালি মানসকে আন্দোলিত করে নব অভিজ্ঞতায়। প্রিয় দেশ বাংলাদেশকে প্রিয়তমা সম্বোধন করে রক্তসাগর থেকে তাকে পুনরায় সবুজে ভরে দিতে কবি বদ্ধপরিকর। নতুন জাতিরাষ্ট্রের ভাগ্যনির্মাণ করেন কবি স্বকীয় চিত্রকল্পের বিচিত্র অবয়বের আত্মঢঙে। যেখানে তাঁর 'প্রিয়তমা'স্বদেশ থাকবে তার প্রেমিকের একান্ত ঔৎসুক্যের মধ্যমণি হয়ে। থাকবে না কোনো স্বৈরতান্ত্রিক সেনাপ্রধানের উদ্ধত বেয়নেট। ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যদর্শনে প্রেমিকারূপী স্বদেশের চিত্রকল্পের নির্মাণ বাংলাদেশকে অন্তরে লালন করে বিজয়ী প্রেমিকের মত। তাঁর আত্মস্বীকারোক্তি ঝরে পড়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত কোণায় কোণায়। কবির প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে তথা বাংলায় বিরাজ করবে সফল অর্থনৈতিক মন্দার পরিবর্তে ভালোবাসার চুম্বনের বেহিসেবী জোয়ার। শিল্পের ছোঁয়ায় সভ্যতা এগিয়ে যাবে তাঁর কাব্যাদর্শের বিম্বিত চিত্রকল্পের বিচিত্র প্রতিভাষে। প্রচন্ড নেতিবাদ থেকে একপ্রকার উজ্জ্বল ইতিবাদী নান্দনিক প্রতিভাস ধরা পড়েছে কবি শহীদ কাদরীর নির্মিত চিত্রকল্পে। বাংলা কবিতায় যা যুক্ত করেছে নতুন প্রাতিস্বিক প্রকরণের বিচরণ।

Reference :

১. বায়তুল্লাহ্‌, কাদেরী, বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা বিষয় ও প্রকরণ (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১৫৯
২. সরকার, আমিন, বাংলাদেশের কবিতায়, চিত্রকল্প, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ২০০৬) পৃ. ১
৩. তদেব, পৃ. ১
৪. বায়তুল্লাহ্‌, কাদেরী, বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা বিষয় ও প্রকরণ, পৃ. ১৬০
৫. তদেব, পৃ. ১৬৩
৬. তদেব, পৃ. ১৭১
৭. তদেব, পৃ. ১৭২
৮. তদেব, পৃ. ১৭৪
৯. আবুল, ফজল, আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতার শিল্পবীক্ষণ (ঢাকা : গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশন, ২০১৪), পৃ. ৬৮
১০. খোন্দকার, আশরাফ হোসেন, রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার অক্ষ দ্রাঘিমা (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স ২০১৩), পৃ: ১৬৯
১১. তদেব, পৃ. ১৬৯
১২. তদেব, পৃ. ১৭১
১৩. তদেব, পৃ. ১৭১
১৪. আবদুল্লাহ্‌, আবু সায়ীদ, ভালোবাসার সাম্পান (ঢাকা: মাওলা ব্রদাস, ২০১৩), পৃ. ৫৮